১ম
খণ্ড
কাটোয়ার
ইতিহাস
ও
সংস্কৃতি
সম্পাদনা : তুষার পণ্ডিত

কাটোয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

তুষার পণ্ডিত

কাটোয়া বইমেলা অছি পরিষদ
ভাষাসদন, ডাকবাংলো রোড, কাটোয়া, বর্ধমান ৭১৩১৩০
ভ্রাম্যভাষ : ৯৪৩৪২৩৮৫৫৮ # ৭৭৯৭৭৫৩৬২৫

Katoar Itihas O Sanskriti
A Collection of Bengali Articles
Edited by Tushar Pandit

প্রথম প্রকাশ
বর্ধমান জেলা গ্রন্থমেলা, ডিসেম্বর ২০০২

দ্বিতীয় সংস্করণ
কাটোয়া বইমেলা, ডিসেম্বর ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব
কাটোয়া বইমেলা অছি পরিষদ

প্রকাশক
শিশির মুখোপাধ্যায়
ভাষাসদন, ডাকবাংলো রোড, কাটোয়া, বর্ধমান ৭১৩১৩০

প্রচ্ছদ
শ্যামল জানা

অক্ষরবিন্যাস
অনিন্দ্যসুন্দর ভট্টাচার্য
ই-৪৩ ব্রহ্মপুর সাউথ এন্ড, কলকাতা ৭০০০৯৬

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট
৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

কলেজ স্ট্রিটের প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর (দীপু)
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

দুই খণ্ড একত্রে আটশো টাকা

কাশীরাম দাস
কৃষ্ণদাস কবিরাজ
গোবিন্দদাস কবিরাজ
জ্ঞানদাস

... দূরবীনে দেখা যায় যেই সব জ্যোতির্ময় কণা
অনন্ত মোমের তেজ নিয়ে নাচে, — সেই সব উচ্চতার রসিক দ্যোতনা
মৃত্যুকে বামনের করতলে হরিতকী অন্তত ক'রে দিক আজ।

প্রথম খণ্ড

কথা-শুরুর কথা

পুরাকাল-পুরাবৃত্ত

ওরা আকাশে জাগাত ঝড়

চৈতন্যায়ন

লোককথা লোককলা

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

দ্বিতীয় খণ্ড

সারস্বত

সাহিত্য সংস্কৃতি

নানা প্রসঙ্গ

ও নদী রে

ওরা আকাশে জাগাত ঝড়

স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমা

বিভূতিভূষণ দত্ত

সূচনা (১৭৫৭-১৮৫৭)

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পড়িবে পায়রে
কে পড়িবে পায়।'

শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থবাদের রন্ধ্রপথে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত। বৈদেশিক বণিকগণ সিংহাসন অধিকার করে ধীরে ধীরে আপন স্বরূপ প্রকাশ করছে— সেইযুগে কয়েকজন চিন্তানায়কের মনে রানি ভবানীর সাবধান বাণী— 'খালকেটে কুমীর এনো না'— এ বাণীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হল। সেই হল হৃত স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির সাধনার সূচনা।

সে প্রচেষ্টার ফলে নন্দকুমারের ফাঁসি, মীরকাসিমের আত্মদান। শাসককুলের বিভীষিকা সৃষ্টি। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার আগুন একবার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হলে আর তার নির্বাণ হয় না। অন্তরে অন্তরে প্রধুমিত সেই আগুন একশো বছর পরে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল সিপাহি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। আবার বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষু অমানুষিক অত্যাচার নির্বিচার হত্যালীলা সে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিল।

প্রস্তুতি-পর্ব (১৮৫৭-১৯০৫)

যুগের প্রয়োজনে যুগমানবের সৃষ্টি। এলেন ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, এলেন বিবেকানন্দ, মোহঘুম ভাঙাবার চোখ ফোটাবার পালা এদের। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেনের কাব্যের ডমরু শিক্ষিত ও চিন্তাশীলদের প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করল। জাতীয় ভাবধারা প্রচারিত হতে থাকল। জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এ ধারার উত্তরসাধক।

সূচনা পর্বে বা সিপাহি অভ্যুত্থানের সঙ্গে কাটোয়ার কোনো যোগসূত্র ছিল কি না আজ আর তার সঠিক প্রমাণ হয়তো পাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু প্রস্তুতি পর্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়ার অবদান উল্লেখযোগ্য। শ্রুতি এবং স্মৃতির গহন হতে যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি আজ সেইটুকুই পরিবেশন করছি। আমি জানি এ বিবরণ পূর্ণ নয়, অনেক কিছু ফাঁক এর মধ্যে থেকে যাবে। তবু স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় যদি কেহ এগিয়ে আসেন এটুকু তাঁকে সাহায্য করতে পারবে।

ব্যঙ্গের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার প্রচ্ছন্ন আভায় গঙ্গাটিকুরির ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় ফুটে উঠে। ১৯০১ সালে মেডিকেল কলেজের ছাত্র কালিকাপুর নিবাসী তরুণ গুণীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়কে দেখা যায় কলিকাতা বিডনস্কোয়ারে কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় বাহিনীর সহকারী সচিবরূপে। গুণীন্দ্রনাথের উপর অনুসন্ধান অফিসের ভার। সেবার দক্ষিণ আফ্রিকা হতে সদ্য প্রত্যাগত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করতে এসেছেন। গুণীন্দ্রনাথ গান্ধীজির পরিচয়পত্রাদি পরীক্ষা করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁকে পৌঁছে দিলেন। এই প্রথম গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ। ডাক্তারি পাশ করে গুণীন্দ্রনাথ প্রথমে বেলডাঙ্গা, পরে কাটোয়ায় ডাক্তারি আরম্ভ করলেন। এইসময় দাঁইহাটের জীতেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত তাঁহার পরিচয়। মণিকাঞ্চনে সংযোগ। জীতেন্দ্রনাথ বিপ্লবী ভাবাদর্শে দীক্ষিত। উভয়ের পরামর্শে ও প্রচেষ্টায় কাটোয়ায় একটি আত্মোন্নতি সমিতি স্থাপিত হয়। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপেশ্বর দাস, রাধাসুন্দর দাস প্রভৃতি এই সমিতির সভ্য হন।

অগ্নি যুগ (১৯০৫-২০)

১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হলে এই আত্মোন্নতি সমিতির উদ্যোগে কাটোয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও কাটোয়ার যুবকবৃন্দ স্বদেশী প্রচার বিদেশী দ্রব্য বয়কট প্রভৃতির মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাখীবন্ধন অরন্ধন স্বদেশী সঙ্গীতের মাধ্যমে জনমনে স্বদেশী ভাবাদর্শ প্রচার প্রভৃতি কর্মসূচি কাটোয়ায় নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হয়। বঙ্গভঙ্গের পর অগ্নিযুগের কার্যকলাপ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ১৯০৫ সালে বিলাতি কাপড় ক্রেতার কাছ থেকে কিনে নিয়ে কাটোয়া চৌরাস্তায় বহ্নিউৎসব হয়। আগুন দেন বালক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। ১৯০৭-০৮ সালে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় নিয়ে স্বদেশী প্রচারে এলেন মুঙ্গের থেকে অরবিন্দ ও কানাই দত্ত নামক দুই যুবক। তাঁরা কাটোয়া স্কুলে জীতেন্দ্রনাথের আহ্বানে বক্তৃতা দিলেন। গৌরাঙ্গ পাড়ায় লাঠি খেলার আখড়া স্থাপন করলেন। বিষ্ণু ভট্টাচার্য, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিয়াপুরের দুর্গাগতি মুখার্জী, দেবগ্রামের কয়েকটি যুবক ওইসময়ের কর্মী। জীতেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় কাটোয়া ও কালনা মহকুমার নানা স্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হল। বাহ্যিক শরীরচর্চা ও গোপনে বিপ্লব মন্ত্র প্রচার সমিতিগুলির উদ্দেশ্য ছিল। কাটোয়া বারোয়ারিতলায় স্বদেশী সভা হয়। সভায় বক্তৃতা দেন আলমপুরের বৈকুণ্ঠ সেন (বহরমপুর প্রবাসী) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ক্ষুদিরাম কানাইলালের ফাঁসির পর কাটোয়ায় বন্দেমাতরম ধ্বনি নিষিদ্ধ হয়। হরিসভা পাড়ার যাত্রাগানের আসরে ৫০/৬০ জন একসঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিলে দারোগা পুলিশ ছুটে আসে। ধরপাকড় করতে গেলে কাকেও শনাক্ত করা গেল না। ১৯০৯ সালে কাটোয়ার এসডিও তারকবাবু সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত 'দেশের কথা' নামক পুস্তকটি জীতেন্দ্রনাথকে পড়তে দেন। বইটি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বিপ্লব আন্দোলন চলতেই থাকে। প্রাদেশিক গুপ্ত সংস্থার সঙ্গে যোগসূত্র রাখতেন জীতেন্দ্রনাথ। চাণ্ডুলীর সুপণ্ডিত অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী আত্মপ্রত্যগাত্মানন্দ নামে পরিচিত) বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচশো টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অনাদায়ে একবৎসর কারাদণ্ড। ইনি অর্থদণ্ড না দিয়ে কারাবরণ করেন। কাটোয়া মহকুমায় স্বদেশী আন্দোলনে ইহাই

প্রথম কারাবরণ। পরে কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি জরিমানার টাকা কোর্টে জমা দেওয়ায় ইনি মুক্তিলাভ করেন। বিপ্লবীদের মধ্যে বন্যাত্রাণ, অসুখে সেবা, হিন্দু সৎকার ইত্যাদি কর্মসূচি ছিল। ১৯১৫/১৬ সালে দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত শিবদাস নামক জনৈক আন্তরীণ বন্দিকে সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয়। ১৯১৭ সালে রাজসাহী জামনাগরা ডাকাতি মামলার আসামী সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মগোপনের জন্য কাটোয়া আসলে জীতেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় দুর্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাকে তিন মাস কাটোয়ায় লুকিয়ে রাখেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে জানাশোনা ও পরিচয় থাকায় জীতেন্দ্রনাথের কাছে বহু বিপ্লবী কেহ আশ্রয়, এবং সাহায্য, কেহ পরামর্শের জন্য আসতেন। ১৯১৭ সালে কাটোয়ার সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বহরমপুর কলেজের ছাত্র। মেন হোস্টেলে থাকেন। এ সময় বহরমপুরে একজন অন্তরীণ বন্দি মারা যান। বহরমপুর কৃষ্ণনগরে পূর্ব হতেই ঢাকার বিপ্লবী ছাত্ররা এসে দলগঠন গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেছেন। সতীশচন্দ্রের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল। সতীশচন্দ্রের আহ্বানে বিষ্ণুপদ এবং আরও দুইজন ছাত্র গোপনে হোস্টেল হতে বার হয়ে মৃতের শোকার্ত সহায়হীন বিপদগ্রস্ত পিতার পাশে দাঁড়ান। শব নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে দাহকার্য সমাপ্ত করে ভোর রাত্রে গোপনে হোস্টেলে ফিরে আসেন। ১৯২০ সালে উল্লাসকর দত্ত জীতেন্দ্রনাথের কাছে সাহায্যের জন্য আসলে অন্নদাবাবুর নিকট হতে পঞ্চাশ টাকা এবং দুর্গেশ চট্টোপাধ্যায় প্রভাস চট্টোপাধ্যায় ক্ষেত্রপদ সাহা প্রভৃতির নিকট হতে কিছু কিছু টাকা নিয়ে তাকে দেন। জনৈক বিপ্লবী সুশীলার হোটেলে উঠে বিষ্ণুদার খোঁজ করেন এবং জীতেনদার কাছে নিয়ে যেতে বলেন। জীতেনদার প্রশ্ন 'কোথা থেকে আসছ?' উত্তর 'বেঙ্গল'। 'কোন বেঙ্গল?' 'যুগান্তর'। সাঙ্কেতিক পরিচয়ে তিনি আশ্রয় পেলেন। কাটোয়ার মুন্সেফ অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগোপনে বিপ্লববাদের সমর্থক ছিলেন। গুণীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই এ বিষয়ে আলোচনা হত।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১-২২)

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধী ডাক দিলেন— না এ সরকারের সঙ্গে আর কোনো রূপ সহযোগিতা নয়। আইন, আদালত, সরকারি চাকুরি বর্জন করো। স্কুল কলেজ বর্জন করো, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করো। মাদক দ্রব্য বর্জন করো, অস্পৃশ্যতা বর্জন করো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলায় বন্যার মতো অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যায়। সে ঢেউ কাটোয়াকেও উত্তাল করে তুলল। গুণীন্দ্রনাথ কংগ্রেস পতাকা হাতে বেড়িয়ে এলেন 'কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান'— সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিড়তে হবে। জীতেন্দ্রনাথ কাটোয়ার রাধাসুন্দর দাসকে প্রধান শিক্ষকের আসনে বসিয়ে দিয়ে শিক্ষকতা ত্যাগ করে ছুটে এলেন কাটোয়ায়। দুই নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গড়ে উঠল কংগ্রেস সংগঠন দিকে দিকে। দলে দলে জোয়ানেরা এগিয়ে এলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে স্বেচ্ছাসেবক রূপে। প্রথম ব্যাচে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম মোদক, তমাল কৃষ্ণ সাহা প্রভৃতি সাতজন কলিকাতায় প্রেরিত হয়ে পিকেটিং করে কারাবরণ করলেন। দ্বিতীয় ব্যাচে

গুণীন্দ্রনাথের দুই পুত্র তারানাথ ও দুর্গানাথ, শ্যালিকা পুত্র শম্ভুনাথ, কমলাক্ষ চন্দ্র ও গৌর দত্ত, শম্ভুরাম, বৈষ্ণব দাসরায় (বেড়ুগ্রাম), মনীন্দ্রনাথ রায় (শ্রীখণ্ড), শান্তিরাম মণ্ডল (মুল্টী কৃষ্ণনগর), শিবপদ মিত্র (চাণ্ডুলী), তড়িতানন্দ ঘোষাল (করুই), বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আতকুলা), অম্বুজাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় (রসুই), মহম্মদ ইসমাইল ও আদিত্যনাথ দত্ত (মাথরুন) প্রমুখ আটবট্টি জন উপরোক্তভাবে কলিকাতায় কারাবরণ করেন। ওইসময় অধিকাংশের একুশ দিন আর কারো কারো একমাস কারাদণ্ড হয়। পরবর্তী ব্যাচে যাবার জন্য সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক কাটোয়ায় প্রস্তুত, অথচ প্রদেশ কংগ্রেস নানা স্থানের বহু স্বেচ্ছাসেবক জমায়েত হওয়ায় স্থান সঙ্কুলান অভাবে নির্দেশ দিলেন আর স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে হবে না।

ইতোমধ্যে স্থানীয় কর্মসূচিও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্কুল বর্জন করে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বর্তমানে যেখানে সুভাষ আশ্রম, জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য বিস্তৃত ময়দান সহ সমগ্র বাড়ীটি দানস্বরূপ পাওয়া গিয়েছে। বিদ্যালয়ে একশো খানা চরকা ও চার-পাঁচখানা তাঁত চালু হয়েছে। মদ গাঁজার দোকানে, বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চলছে। পিকেটিং করায় অনেকে গ্রেপ্তার ও দুই-তিন সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অনেককে কোর্টে হাজির করার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। গুণীন্দ্রনাথ, জীতেন্দ্রনাথ, হরেরাম মণ্ডল ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। বর্তমান প্রবন্ধ লেখক বিভূতিভূষণ দত্ত ১৯২১ সালেই ছাত্রাবস্থায় স্কুল বর্জন করে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক রূপে পিকেটিং, গ্রামে গ্রামে অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি কর্মসূচিতে যোগদান করেন। সালারে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তথায় ছাত্ররূপে ভর্তি হন। ১৯২২ সালে বারদৌলীতে জনসাধারণ পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিংসার তাণ্ডবে থানা আক্রমণ করে বেড়া আগুনে থানা অফিসার সহ সকলকে মোট বাইশজনকে জীবন্ত দগ্ধ করে। গান্ধীজি তাতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং জাতীয় কংগ্রেসকে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পরামর্শ দেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাংলার বিপ্লবীগণের পরম হিতৈষী ছিলেন। দেশবন্ধুর আহ্বানে বিপ্লবীগণও সাময়িকভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। কালনা-কাটোয়া মহকুমার বিপ্লবী সংস্থার সভ্যগণও জীতেন্দ্রনাথের আহ্বানে এই আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন, কেউ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কাটোয়ার ব্যবসাদার সম্প্রদায়, জমিদার অন্নদাপ্রসাদ সাহাচৌধুরী প্রমুখ ধনী ব্যক্তিগণ গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়, রামরঞ্জন সিংহ, কমলাক্ষচন্দ্র, তারাপদ খাঁ, চরন্ধ বাবু, পদবাবু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আন্দোলন পরিচালনে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করেছেন। কাটোয়ায় দুইজন কনস্টেবল ১৯৩০ সালে এই আন্দোলনে সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র, সোহিনী দেবী, বিমলপ্রতিভা দেবী, মাখন সেন এই সময় কাটোয়ায় জনসভা করেছেন।

সংগঠন ও গঠনমূলক কাজ (১৯২২-৩০)

কাটোয়া মহকুমার প্রায় সমস্ত গ্রামে কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত হয়। ১৯২১ সালেই বাজার বনকাপাসীতে একটি চরকা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। জীতেন্দ্রনাথের আহ্বানে সুরেন নিয়োগী কাটোয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে

তাঁত চরকা ও বৈদ্যপুর হাইস্কুলে ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ ও হিন্দি প্রচলনে সহায়তা করেন। বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়া মাধবীতলায় একটি খদ্দর বিক্রয় কেন্দ্র খোলেন। সালার জাতীয় বিদ্যালয়ে ১৯২২ সালে একটি খদ্দর উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শ্রীখণ্ডের মনীন্দ্রনাথ রায় বহরমপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে ব্রতী হন। ১৯২৩ সালে কাটোয়া জাতীয় বিদ্যালয় অবলুপ্ত হয়। তথায় পরবর্তীকালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছিল। ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের কার্যাদি ও জাতীয় বিদ্যালয় পরিত্যাগে সম্মত না হওয়ায় বিভূতিভূষণ বাড়ি হতে বহিষ্কৃত হলে সালার খাদি আশ্রমে কর্মী রূপে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ১৯২২ সালে কলিকাতা স্ট্রিট সত্যাগ্রহে তমালকৃষ্ণ সাহা এবং আরও কয়েকজন যোগদান করেন। ১৯২১ সালে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য কাটোয়া হতে বহু অর্থ সংগৃহীত হয়। ১৯২৩ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে বিষ্ণু ভট্টাচার্য এবং আরও ৪জন সংবাদ পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে যান এবং সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টি স্থাপনে জীতেন্দ্রনাথ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একান্ত সহযোগী হিসেবে সংগঠন চালিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে জীতেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় বিভূতিভূষণ দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির কর্মী রূপে বেরুগ্রামে একটি চরকা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এবং জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর প্রবর্তিত ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের ভাবধারা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বেড়ুগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রতিমাসে ১।।০ দেড়মণ করে চরকার সুতো বৈদ্যপুর স্কুলে খদ্দর কাপড় তৈরির জন্য পাঠানো হত। ১৯২৭ সালে সালার খাদি আশ্রমের কর্মী সংকটে বিভূতিভূষণ পুনরায় সালার খাদি আশ্রমের দায়িত্বভার নিয়ে কাটোয়া দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে খদ্দর সরবরাহ করতে থাকেন। সালার হতেই বেড়ুগ্রাম চরকাকেন্দ্র পরিচালন এবং বৈদ্যপুর স্কুলে সুতা সরবরাহ হত।

বর্ধমান জেলা কংগ্রেসে কাটোয়া মহকুমার প্রতিনিধি ছিলেন গুনীন্দ্রনাথ ও বংশগোপাল চৌধুরী। আজীবন অকৃতদার জীতেন্দ্রনাথ স্বীয় সংগঠনী প্রতিভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহসম্পাদক হন। ওইসময় সর্বসময় বি.পি.সি.সি অফিসে থাকায় তিনিই একপ্রকার সর্বসম নিয়ামক ছিলেন বলা যায়। প্রদেশ কংগ্রেসের বিগ ফাইভ অর্থাৎ যাঁদের অর্থানুকুল্যে কংগ্রেস চলত সেই নলিনীরঞ্জন সরকার, শরৎ বসু, বিধান রায়, তুলসী গোঁসাই আর নির্মলচন্দ্র জীতেনদাকে সমূহ শ্রদ্ধা করতেন। সম্পাদক কিরণশঙ্কর সর্ববিষয়ে জীতেনদার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরেই দেশের কাজে নেমে যান। তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র জীতেনদার স্নেহভাজন ছিলেন। সাইমন কমিশন বর্জনের সময় এবং কর্পোরেশন ইলেকশনে জীতেনদার সংগঠনী শক্তিতে সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হন। জীতেনদা সুভাষচন্দ্রকে বর্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া, রাণীগঞ্জ, কালনা এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে ছিলেন বা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

টেররিস্ট গ্রুপ আবার সক্রিয় হয়ে উঠছিল। জীতেনদা আর তাঁদের সঙ্গে না যাওয়ার, কংগ্রেসের সংগঠনে থাকায় তাদের রাগ বা অভিমান হয়। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বর্ধমান জেলার প্রতিনিধিরূপে কাটোয়া হতে জীতেন্দ্রনাথ, গুনীন্দ্রনাথ, বিষ্ণুপদ, হরেরাম, এবং মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে বিভূতিভূষণ যোগদান করেন।

লবণ আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১)

দীর্ঘকাল প্রস্তুতির পর গান্ধীজি আবার আইন অমান্যের ডাক দিলেন। এবার লবণ আইন অমান্য। মহাত্মাজির ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান। আবার সমগ্র দেশ আন্দোলনে উত্তাল। এবারের আন্দোলনে কাটোয়ার গণ অভ্যুত্থান অভূতপূর্ব। মেদিনীপুরের অবদান সর্বোচ্চ। পরেই কাটোয়ার স্থান।

গুণীন্দ্রনাথ-জীতেন্দ্রনাথ সর্বাধিনায়ক। অধিনায়ক হিসাবে বিষ্ণুপদ-হরেরামের সঙ্গে যোগ দিলেন সরকারি মোহ পরিত্যাগ করে নবাগত জ্যোতিষ সিংহ। আর দাঁইহাটের স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাস জীবন হতে পুনরায় রাজনীতিতে এলেন এবং পশ্চিম মঙ্গলকোটের কাশিয়ারের আবুল হায়াত ও গণপুরের নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যোগ দিলেন। সহ অধিনায়ক ক্ষুদিরাম তারানাথের সঙ্গে যোগ দিলেন নবাগত বালক কোঁয়ার, মহিমারঞ্জন ঘটক, এককড়ি দত্ত, নির্মলানন্দ ঠাকুর, মুন্সী বাহারউদ্দিন। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জমিদার অন্নদা সাহাচৌধুরী, দুর্গাপদ দত্ত, সত্যনারায়ণ রায়, সত্যকালী রায়, রাধাগোবিন্দ সাহা, নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত, শিশির দত্ত, জপেন দাস, বনবিহারী সাঁই, গোলাম নবী, রমজান সেখ (ভাদু সেখ), মিহির মিস্ত্রী, ব্রহ্মানন্দ মিস্ত্রী এবং আরও অনেকে। দাঁইহাটের ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, যামিনী দত্ত, সরোজ ভট্টাচার্য, অঘোর সাহা, সিদ্ধেশ্বর সাহা, যোগেশচন্দ্র মণ্ডল, দুর্গাপদ কাঁসারী, মণীন্দ্র ব্যানার্জি, যোগেশ মণ্ডল, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র এবং আরও অনেকে। বর্ধমান হতে প্রথম লবণ সত্যাগ্রহী দলে পলসোনার ভক্ত সোম এবং চাণ্ডুলীর চণ্ডীচরণ মিত্র কাটোয়ার প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। জামড়ার গোবিন্দ চৌধুরী, সদানন্দ চৌধুরী, শ্রীখণ্ডের রাসবিহারী রায়, সুধীর গুপ্ত, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর, সুশীল কবিরাজ প্রভৃতি। কোশীগ্রামের রামঅক্ষয় রায়, হরিহর ভট্টাচার্য, সত্যহরি মুখোপাধ্যায়, সুধাকৃষ্ণ গড়াই, জপহরি মণ্ডল প্রভৃতি। বিজনগরের হরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়, গোসুম্বার ভূপেন দত্ত, গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী, করজগ্রামের অশ্বিনী মণ্ডল, আলমপুরের পার্বতী ভট্টাচার্য, ভালসুনির কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়, কলসার গোপেশ্বর সিংহ, কৈথনের কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য, চন্দ্রপুরের মুক্তিপদ রায়, মেঝিয়ারীর নবগোপাল কুণ্ডু, পলসোনার শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, ওকর্সার বিমলাপতি চৌধুরী, মুস্থলির ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কুরচির মোহিনী হাজরা, করুই-এর শরদিন্দু চক্রবর্তী, সিঙ্গীর ক্ষিতিশ চট্টোপাধ্যায়, পরশুরামপুরের শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য, চাণ্ডুলীর পঞ্চানন দত্ত, ক্ষীরগ্রামের দাশরথি চৌধুরী, পঞ্চানন চৌধুরী, উমাপদ চৌধুরী, বাজারের শিবশঙ্কর চৌধুরী, খেড়ুয়ার সত্যহরি মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, যামিনী চট্টোপাধ্যায়, নিগনের কৃষ্ণচন্দ্র সর, বলরামপুরের তারাপদ নন্দী, কেতুগ্রামের ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচুন্দীর অকুল চট্টোপাধ্যায়, রাম চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরোলের তারাপদ গনাই, দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, ভৈরব মজুমদার, কালীকিঙ্কর পরামাণিক, বারেন্দার আদ্যনাথ চক্রবর্তী, মৌগ্রামের উপেন ঘোষ, বিজলী দাস, শান্তি ঘোষ প্রভৃতি। গোমাই-এর সত্যানন্দ চ্যাটার্জী, গঙ্গাটিকুরীর রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বেড়ুগ্রামের বৈষ্ণব রায়, জলীল মিঞা, কোমরপুরের ত্র্যম্বক ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্র মিস্ত্রী, আমগড়িয়ার অন্নদাপ্রসাদ রায়, কান্দরার ভোলানাথ ধর, মুরলীমোহন ঠাকুর, ধান্দলসার ত্বিষাম্পতি গনাই, ভাণ্ডারগড়িয়ার তারাপদ রায়, মাসুন্দীর গুরুপদ মিশ্র প্রমুখ প্রায় ১৫০০ সংগ্রামী এই আন্দোলনে কারাবরণ করেন। চুড়পুনীর শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিরাজ) বীরভূম জেলা থেকে

এবং বিভূতিভূষণ মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কাটোয়া মহকুমার অগ্রদ্বীপ নিবাসী বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করে মহকুমার গৌরব বৃদ্ধি করেন। এই আন্দোলনে মহিলাদের মধ্যে নির্মলা সান্যাল ও সুরমা দেবী কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে সুভাষচন্দ্র কাটোয়ায় দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন। সুভাষ আশ্রমে বিরাট জনসভা হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩২-৩৪)

১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন প্যাক্টে সমুদয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর কারামুক্তি ঘটে। ভারতীয় নেতাদের ইংল্যান্ডে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে মহাত্মা গান্ধী জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। আলোচনায় জাতীয় কংগ্রেসের দাবির প্রতি মর্যাদা না দেওয়ায় বৈঠক ব্যর্থ হয়। ফেরার পথে বোম্বাই-এ অবতরণ কালে সমুদয় নেতা গ্রেপ্তার হন। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে সর্বত্র গ্রেপ্তারের ধুম পড়ে যায়। পূর্ব-আন্দোলনেও কংগ্রেস সংগঠনের যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের তালিকা ভারত সরকার এবার আগে থেকেই তৈরি রেখে প্রস্তুত ছিলেন। কাটোয়ায় গুণীন্দ্রনাথ, জীতেন্দ্রনাথ, স্বামীজী, জ্যোতিষচন্দ্র, হরেরাম, বিষ্ণুপদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ, মহিমারঞ্জন, নির্মল, ক্ষুদিরাম, বালক, তামাল, তারানাথ, এককড়ি প্রভৃতি কর্মীবৃন্দ সকলেই কারান্তরালে। নির্মলা সান্যালের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা কারাবরণ করে। এ আন্দোলনে মহিলারাও গৃহ অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এলেন। সুরমাদেবী, নির্মলা সান্যালের সঙ্গে গুণীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ কমলা মুখোপাধ্যায় (শিশুকন্যা সহ), বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, কমলিনী মুখোপাধ্যায়, সুভাষিনী চন্দ্র, দুর্গাদেবী, শিবানী দেবী, ষোড়ষীবালা ঘোষ, মঞ্জুরাণী ঘোষ ইত্যাদি কারাবরণ করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বহিষ্কার আদেশে এবার বিভূতিভূষণের মুর্শিদাবাদ প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিভূতিভূষণ কেতুগ্রামের গ্রামে গ্রামে জনসভা করে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন। বৈরাগ্যতলার মেলায় বহু স্বেচ্ছাসেবকের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করে মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বহিষ্কার আদেশ ভঙ্গ করায় দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমার প্রায় একহাজার সংগ্রামী কারাবরণ করেন।

বিরতি ও প্রস্তুতি (১৯৩৪-৪০)

১৯৩৪ সালের পর হতে আবার প্রস্তুতি পর্ব। এইসময়ে গুণীন্দ্রনাথ সুরাট, অমৃতসর, করাচী, কোকনদ, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে বর্ধমান জেলার প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। তিনি দুইবার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য হয়েছেন। ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস বেআইনি থাকা কালে কলিকাতা ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভানেত্রী নেলী সেনগুপ্তা গ্রেপ্তার হলে গুণীন্দ্রনাথ পরবর্তী সভাপতি মনোনীত হন। তাঁর বাড়ি তখন পুলিশ প্রহরায়। গঙ্গাস্নানের বেশ ধরে বাড়ি হতে বাহির হন। গঙ্গা পার হয়ে দেবগ্রাম হয়ে কোনোমতে কলিকাতা পৌঁছে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেন। তিনি বহুকাল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য এবং বর্ধমান জেলা

কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বিষ্ণুপুর, বহরমপুর, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে গুণীন্দ্রনাথ অধিকাংশেরই সুপরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের প্রতি সর্বভারতীয় দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরূপতায় ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি হলে গুণীন্দ্রনাথ, স্বামীজী, মহিমারঞ্জন ফরওয়ার্ড ব্লকের শাখা স্থাপন করেন। এইসময়ে কামাখ্যা মজুমদার, ডা. বসন্তকুমার কাটোয়ার কংগ্রেস পরিচালনা করেন। বিভূতিভূষণ কারামুক্ত হওয়ার পরেই বিহারে ভূমিকম্প হয়। তিনি ওই ভূমিকম্পে আর্তত্রাণে চলে যান। ১৯৩৫ সালে তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সতীশ দাশগুপ্তের ডাকে সোদপুর গিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মী রূপে থাকাকালীন বর্ধমানে দামোদরের বাঁধ ভেঙে যে প্রলয়ঙ্কর বন্যা হয় তাতে বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ সমিতির (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত) কর্মী রূপে ত্রাণ কার্য করেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরূপে বিভিন্ন স্থানে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৯৪০ সাল থেকে তিনি মাসুন্দিতে থেকে কাটোয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে যোগদান করেন।

একক সত্যাগ্রহ (১৯৪০-৪১)

দীর্ঘকাল পর গান্ধীজি দেশের প্রকৃত অবস্থা, আগামী সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিলে দেশ কতটা প্রস্তুত তার সমীক্ষার ভার প্রতি জেলার এক একজন গান্ধীবাদী নিষ্ঠাবান কর্মীর উপর দেন। বর্ধমান জেলার সর্বজনমান্য নেতা শ্রী বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের উপর এই ভার অর্পিত হয়। বিজয়দা পদব্রজে বর্ধমান জেলার সমুদয় গ্রাম পরিক্রমণ করেন। কাটোয়া মহকুমায় পরিক্রমায় আসলে মাসুন্দীতে বিভূতি দত্তের বাড়িতে, পলসোনায় ভক্তসোমের বাড়িতে এবং কাটোয়া শহরে মহিমারঞ্জন ঘটকের বাড়িতে এবং অন্যান্য অঞ্চলে পরিচিত কর্মীদের বাড়িতে অবস্থান করে সেই সেই অঞ্চলের সমুদয় গ্রামের সমীক্ষা করেন। পরবর্তী অগাস্ট বিপ্লবের চিন্তাধারা পরিপ্রেক্ষিতেই এই সমীক্ষার প্রয়োজন।

ইহাই একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এই আন্দোলন ভারতের সর্বত্র প্রতিপালিত হয়।

অগাস্ট বিপ্লব (১৯৪২-৪৪)

সমীক্ষায় জানা গেছে দেশ বিপ্লবমুখী— অগ্নিগর্ভ। সময় অনুকূল। সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীরাও সজাগ। সময়োচিত আঘাত হানতে সমুৎসুক। আবার ডাক দিলেন মহাত্মা গান্ধী। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দিলেন— 'আর কোনো আপোষ নয়— তোমরা ভারত ছাড়ো।' সংগ্রামীদের কানে মন্ত্র দিলেন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। সারা ভারতবর্ষ উদ্বেল, অধীর। কাটোয়া মহকুমাও আবেগ কম্পিত। ঘরে ঘরে সৈনিকেরা প্রস্তুত বিদেশী শাসককে শেষ আঘাত হানবার জন্য।

জননায়ক, কাটোয়া মহকুমার অবিসংবাদিত নেতা গুণীন্দ্রনাথের আহ্বানে সুভাষ আশ্রমে শেষ পরামর্শ সভা। উপস্থিত হয়েছেন গুণীন্দ্রনাথ, বিষ্ণুপদ, হরেরাম, মহিমারঞ্জন, স্বামীজী, জ্যোতিষচন্দ্র, বসন্তকুমার, বিভূতিভূষণ, ভক্ত সোম, কামাখ্যা মজুমদার, আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিত্যগোপাল সামন্ত, সাতকড়ি সামন্ত, দেবেশ কুণ্ডু, নির্মলানন্দ ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন। মূল প্রস্তাব— ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে সর্বপ্রকারে স্তব্ধ করে দিয়ে ভারত ছাড়তে বাধ্য করতে হবে। হয়তো অনেককে জেলে যেতে হবে, হয়তো মৃত্যুবরণও করতে হবে। তবে গ্রেপ্তার এড়াতে পারলে গোপনে কাজ চালিয়ে যেতে হবে, আমাদের মন্ত্র হবে— 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে', হয় বিজয় নয় মরণ।

অনেক রাত্রে সম্মেলন শেষে অনেকেই বাড়ি গেলেন কেহ কেহ আশ্রমে থাকলেন কেহ কেহ স্টেশনে চলে গেলেন। সরকার পক্ষ আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। ভোর রাত্রেই নেতৃবর্গের বাড়ি ও আশ্রম পুলিশ বেষ্ঠিত হয়। যাদের পাওয়া গেল গ্রেপ্তার করা হল। স্টেশনে চলে যাওয়ায় ভক্ত সোম, বিভূতিভূষণ ওইদিন গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেলেন। পরে দলবল সহ পুলিশ তাদের বাড়ি ঘেরাও ও সার্চ করেও তাদের ধরতে পারে নাই। বিভূতিভূষণ, ভক্ত সোমকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়। বর্ধমানে আত্মগোপনকারী নেতা দাশরথি তা-এর সহিত এদের সংযোগ স্থাপিত হয়। নূতন নূতন কর্মী সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসমূলক কার্যাদি সংঘটিত হতে থাকে। সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিনে সংবাদ আদান প্রদানের কাজ চলতে থাকে। বর্ধমান জেলার অগাস্ট বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক হিসেবে দাশরথি তা ওইসময়ে একটি জাতীয় সরকার (Parallel Govt.) ঘোষণা করেছিলেন। ওই ঘোষণায় বর্ধমান জেলার অধিকর্তা (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) রূপে দাশরথি তা কাটোয়া মহকুমার অধিকর্তা রূপে এস.ডি.ও বিভূতিভূষণের নাম ঘোষণা করা হয়। বিভূতিভূষণ গ্রেপ্তার হলে ভক্তভূষণ সেই পদে অভিষিক্ত হবে নির্দিষ্ট থাকে। জাতীয় সরকারের প্রচার বিভাগ এবং গোয়েন্দা বিভাগ সক্রিয় ছিল। এই আন্দোলনে পলসোনা গ্রাম আত্মগোপনকারী সংগ্রামীদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল। জাতীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় বহুবার পুলিশ এলেও সংগঠকদের কাউকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এইভাবে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কিয়দংশে এবং কাটোয়া মহকুমায় ১১ মাস যাবৎ গুপ্ত আন্দোলন চালিয়ে অবশেষে বিভূতিভূষণ বীরভূমে গ্রেপ্তার হয়ে সিউড়ি প্রেরিত হয়। সিউড়ি পুলিশ কাটোয়ায় পাঠান। কাটোয়া থেকে বর্ধমান জেলে প্রেরিত হন। ভক্ত সোমকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তিনি শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যান। ডাক্তার বসন্তকুমার, প্রদ্যোৎ চৌধুরী, পলসোনার গৌরগোপাল সরকার আটক আইনে গ্রেপ্তার হন। পলসোনার সাতকড়ি সামন্ত, কালীদাস রায়, মনুজ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন। নলাহাটির নেপাল চ্যাটার্জী বোলপুর স্টেশনে পুলিশের গুলি বর্ষণে নিহত হন। গীধগ্রাম-এর অজিত চক্রবর্তী, প্রভাস রায়চৌধুরী, দুর্গাপদ চক্রবর্তী, তুলসী সিংহ রায়, মুরারী সিংহ রায়, গোপাল পাল, বটকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীখণ্ডে লালবিহারী দত্ত, মেজিয়ারীর দেবেন কুণ্ডু, করুই-এর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কুরচির সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল, মাসুন্দীর রাধাশ্যাম সাহা ধ্বংসমূলক কাজে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হন। মাজিগ্রামের শম্ভু চৌধুরী পলাতক থাকায় তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি পুলিশ ক্রোক করে। বালক মদন চৌধুরী এই আন্দোলনে সক্রিয় সহায়তা করায় গ্রেপ্তার হন। এবং পরে মুক্তিলাভ করেন। কুরচির হৃষীকেশ মণ্ডল ১৯৪৩ সালে বেআইনী সবরমতী আশ্রমে প্রবেশকালে ধৃত ও ২১ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যারবেদা জেলে অবস্থান করেন। নলিয়াপুরের জনৈক সংগ্রামী মুঙ্গেরে এবং কাটোয়া-মন্তেশ্বর সীমান্ত গ্রামের জনৈক সংগ্রামী বেনারসে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

প্রাক স্বাধীনতা পর্ব (১৯৪৪-৪৭)

এই সময়ে কাটোয়া কংগ্রেসের সভাপতি হৃষিকেশ মণ্ডল, সম্পাদক ডা: বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ-সম্পাদকদ্বয় বিভূতিভূষণ দত্ত, ভক্ত সোম, কোষাধ্যক্ষ মহিমারঞ্জন ঘটক, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠক মদন চৌধুরী। একদিকে নেতাজীর অন্তর্ধান এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপে পুনরাবির্ভাব, অন্যদিকে অগাস্ট বিপ্লবের অভ্যুত্থান ভিতরে বাহিরে আক্রান্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকার এদেশ হতে পাততাড়ি গুটাবার সংকল্প করল। কিন্তু যাবার আগে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দ্বিজাতি তত্ত্বের সর্বনাশা বিষ প্রয়োগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার মাধ্যমে চির অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়ে তারা বিদায় নিল। কাটোয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমান সম্প্রদায়ের আতঙ্ক বিদূরিত করে মনোবল ফিরিয়ে আনতে অগ্রণী গুণীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাটোয়া কংগ্রেস ও কাটোয়ার সুধীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতায় সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়েছে, কিন্তু রণক্লান্ত সৈনিকদের 'আমি সেইদিন হব শান্ত'– সেই শান্ত হবার দিন কি ফিরে এসেছে?

❑ হরিগোপাল ঘোষাল সম্পাদিত *কাটোয়া দর্পণ* পত্রিকায় (শারদ সংকলন ১৩৮৬) প্রকাশিত।

অবিস্মরণীয় সেই দিনগুলি

অজয়কুমার রায়

১৯৩০ সালের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গোটা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের সে কি উত্তাল তরঙ্গ। সে তরঙ্গ থেকে কাটোয়া বাদ যায় নাই— শহর ও মহকুমা। দরিদ্রতম মানুষ থেকে ধনী ব্যক্তি পর্যন্ত এই আন্দোলনে শামিল হলেন। আমরা তখন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ও গানের স্কোয়াড। বড়ো বড়ো সভা শোভাযাত্রায় স্বদেশী গান গাই— মদের দোকানে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করি— ঢেড়া দিয়ে কংগ্রেসের প্রোগ্রাম প্রচার করি। কারণ মাইক তখন ওঠে নাই। মাঝেমধ্যে কংগ্রেস থেকে বয়কট করা লোকদের পিছন পিছন যাই ও বাড়ির সামনে মোতায়েন থাকি। কাঠগোলার কংগ্রেস আশ্রম স্বেচ্ছাসেবকদের হেড কোয়ার্টার, কাটোয়া চৌরাস্তার সন্নিকট গাঁজা অফিসের দোকানের লাগাও দক্ষিণে টাউন কংগ্রেস অফিস। এখন সেখানে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা। কাটোয়া কংগ্রেসের তৎকালীন একছত্র নেতা ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক বালককৃষ্ণ কোঁয়ার। উগ্র কার্যকলাপ এমনকী প্রয়োজনে কিছু কিছু বেআইনি কার্যকলাপের জন্য অধিনায়ক ক্ষুদিরাম মোদক। গুণেন্দ্রনাথ শোভাযাত্রার পুরোভাগে জাতীয় পতাকা হস্তে প্রায় থাকতেন। যে রাস্তা দিয়ে যেতেন দুধারে লোক নিজ নিজ আসন ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে এসে প্রণাম করতেন। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা পেতেন। তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবী স্বামীর সহধর্মিনী ছিলেন— বড়ো বড়ো সভায় বক্তৃতা করতেন, শোভাযাত্রায় মহিলাদের পুরোভাগে জাতীয় পতাকা হাতে থাকতেন— দেশে বিদেশে প্রচার অভিযানেও যেতেন। ডা. গুণেন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসকের কারাগারে বারবার বন্দি হয়েছেন— সুরমা দেবীও গেছেন। সুরমা দেবী একবার পৌর কমিশনার হন। ডা. গুণেন্দ্রনাথের পুত্র তারানাথ ও বদ্রীনাথ এবং পুত্রবধূ কমলা সবাই জাতীয় আন্দোলনের সৈনিক। বারোয়ারিতলার বাড়িটি যেন জাতীয় বিপ্লবের আশ্রয়স্থল ও প্রতীক হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের বড়ো বড়ো জনসভা কংগ্রেস আশ্রম কাঠগোলায় এবং পুরোনো মেছোবাজারে হত। সভাপতি থাকতেন প্রায়ই ডা. গুণেন্দ্রনাথ। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বিমল প্রতিভা দেবী, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বক্তা এসেছেন— বক্তৃতা করেছেন। যতদূর মনে আছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও বিমল প্রতিভা দেবী পুরোনো মেছোবাজারের সভায় বক্তৃতা করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা স্বরূপ। কংগ্রেস ভবনের প্রাঙ্গণে সভা, সমগ্র কাঠগোলা লোকে ভর্তি, দক্ষিণে ফুটবল খেলার মাঠ পর্যন্ত। দলে দলে শোভাযাত্রা, সাইকেল শোভাযাত্রা, স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ, ঢোল সানাই ও ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা। সে যেন এক মহামিলন ক্ষেত্র। বড়ো বড়ো শোভাযাত্রা বারোয়ারিতলা থেকে বের হত যার শেষপ্রান্ত বারোয়ারিতলায় আর সম্মুখভাগ চৌরাস্তা অতিক্রম করে নিচু বাজারে তেরাস্তার সংযোগস্থলে স্পর্শ করত। শোভাযাত্রায় স্বদেশী গান, নানারকম বাজনা ও মাঝেমধ্যে শ্লোগান থাকত। একটা

বড়ো শোভাযাত্রার সামনে অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল সুসজ্জিত। স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ হত 'কংগ্রেস ভবন' প্রাঙ্গণে, করাতেন অধিনায়ক বালককৃষ্ণ কোঁয়ার। নীল রঙের খদ্দরের প্যান্টশার্ট। মাথায় গান্ধী টুপি বুকে হুইসেল আঁটা। তিনি হুইসেল দিলেই স্বেচ্ছাসেবকেরা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তেন। বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিংয়ের জন্য স্বেচ্ছাসেবক মোতায়ন করার দায়িত্ব তাঁর ছিল। টাউন কংগ্রেস অফিসের নোটিশ বোর্ডে তাঁর সই করা ডিউটি দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা থাকত। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাই দেখে নিজ নিজ ডিউটিতে চলে যেতেন। এটা খুব শৃঙ্খলার সহিত পালিত হত। স্বেচ্ছাসেবকদের ডিউটি পড়ত গাঁজা আফিমের দোকানে, মদের দোকানে ইত্যাদিতে। একদিন গাঁজার দোকানের সামনে পিকেটিং করার সময় পাড়াগাঁয়ের এক গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধ উপেক্ষা করে শুয়ে পড়া স্বেচ্ছাসেবকদের বুকের ওপর দিয়ে গাঁজা কিনলেন। চৌরাস্তার দিকে ফেরার সময় দু-তিনটি ছেলে তাকে মুরকিহাটার গলিতে ডেকে নিয়ে যায়। ক্ষুদিরামদার হুকুমে ছেলেরা তার বুকে বসে গোঁফ ধরে টানতে থাকে। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক চলে যান আর কোনোদিন আসেন নাই। কাটোয়ার তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত জমিদার শ্রেণির একজন ওই অপরাধে কংগ্রেস কর্তৃক বয়কট হন। তাঁর বাড়ির সামনে পাহাড়া, রাস্তায় বেরুলে পিছু পিছু স্বেচ্ছাসেবক। ফলে বেচারার বাড়িতে গোয়ালার দুধ দেওয়া বন্ধ, বাজার হাটে কেউ তাঁকে জিনিস বিক্রয় করে না। তিন-চার দিন পর তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে ক্ষমা চান ও কিছু টাকা জরিমানা দেন। স্টেশন বাজারের এক দোকানদার গোপনে চোলাই মদ বিক্রি করার জন্য ওইরূপ শাস্তি পান।

ওইরূপ আন্দোলন চলতে চলতে ইংরেজ সরকার তার নিজমূর্তি ধারণ করলেন। ডা. গুণেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন। প্রতিবাদে শহরে হরতাল ও বৈকালে পুরোনো মেছুয়া বাজারে প্রতিবাদ সভা। সরকার ওই সভা ও শোভাযাত্রায় ১৪৪ ধারা জারি করলেন। শোভাযাত্রা হল না কিন্তু প্রতিবাদ সভা আরম্ভ হল। বক্তারা একে একে গ্রেপ্তার হলেন। এইভাবে বাহার মিঞা, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, দুর্গাপদ দত্ত আরও অনেকে। সভাস্থলে তদানীন্তন জবরদস্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর গোষ্ঠ দত্ত (যাঁকে সে সময় টাউনের ছেলেরা দেখলেই 'মামা, মামা' ডেকে ক্ষেপাত) বিরাট এক পুলিশ বাহিনী নিয়ে উপস্থিত। একজন বক্তা ওঠেন কিছু বক্তৃতা করেন গ্রেপ্তার হন, তারপর আর একজন। এইভাবে বেশ কিছু গ্রেপ্তার হওয়ার পর সভা পুলিশ ভেঙে দেয়। পরের দিন ডা. গুণেন্দ্রনাথ ও কাটোয়ার তদানীন্তন জমিদার অন্নদাপ্রসাদ সাহাচৌধুরীকে গ্রেপ্তার অবস্থায় বর্ধমান চালান দেওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে কাতারে কাতারে লোক কোর্টে হাজির হল। বিকেলের দিকে (বোধহয় শ্রাবণ মাস) একটি বাসে তাঁদের চাপিয়ে— সশস্ত্র প্রহরী ও একজন ইংরেজ পুলিশ সাহেবের প্রহরায় তাঁদের ছোটোলাইনের গাড়িতে বর্ধমান নিয়ে যাওয়া হবে। বর্তমান টাউনহল প্রাঙ্গণের উত্তর পশ্চিমদিকে অর্থাৎ মোক্তার বজলাল হোসেনের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর স্বেচ্ছাসেবক ও জনতাই বাসে যাত্রা রোধ করে শুয়ে পড়লেন। বাস যেতে পারছে না। বর্ধমান লাইনের ট্রেনের বিশেষ দেরি নাই। তার উপর ওইরকম ঔদ্ধত্য পুলিশ সাহেবের অসহ্য হল। তিনি ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নেমে জনতাকে অবোধ্য ভাষায় কি বলে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। সম্ভবত

গালিগালাজ করছিলেন। ইন্সপেক্টর গোষ্ঠবাবুকে কি বললেন আর অমনি গোষ্ঠবাবু পাঁচমিনিট সময় দিয়ে জনতাকে সরে যেতে বললেন, না হলে গুলি চলবে। গুণেন্দ্রনাথ জনতার ওপর গুলি চলার আশঙ্কায় হাতজোড় করে পথ ছেড়ে দিতে বলছেন— পরিস্থিতি অত্যন্ত গরম। এমন সময় জনতার মধ্য থেকে কে একজন পুলিশ সাহেবের গালে এক চড় কষে দিতেই তিনি বাসে উঠে পড়লেন। কিন্তু গোষ্ঠবাবুর নির্দেশে নিকটস্থ ট্রেজারি থেকে আট-দশ জন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে পড়ল। গুনীন্দ্রবাবুর অনুরোধে জনতা পথ ছেড়ে দিলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রহরায় ওই বাস চলতে লাগল। হঠাৎ টাউন হলের মাঠ থেকে (তখন মাঠ ঘেরা ছিল না) বাগান পাড়ার মুসলমান মুটে মজুররা বাস আক্রমণ করে পাথর ছুঁড়তে লাগল। বাস জোরে স্টেশনের দিকে চলে গেল।

ডা. গুণেন্দ্রনাথ ও অন্নদা সাহাকে নিয়ে বাসটি পুলিশ সাহেবের নির্দেশে ছোটোলাইনের স্টেশনের দক্ষিণে এলে তাদিকে নামিয়ে সশস্ত্র প্রহরায় স্টেশনে আনা হল।

সশস্ত্র সিপাইদের বিদ্রোহ

স্টেশনে বিরাট জনতা উপস্থিত হল। রবরবা হল যে গুণেন্দ্রনাথ ও অন্নদাবাবুকে তৃতীয় শ্রেণির গাড়িতে বর্ধমান নিয়ে যাওয়া হবে। জনতা হতে দেবে না। জনতার দাবি প্রথম শ্রেণিতে নিয়ে যেতে হবে, না হলে গাড়ি ছাড়তে দেবে না। স্বেচ্ছাসেবক অধিনায়ক বালকদার নির্দেশে জনতা ও স্বেচ্ছাসেবক ইঞ্জিনের সম্মুখে রেললাইনে শুয়ে পড়ল। গাড়ি ছাড়তে দেরি নেই। পুলিশ সাহেব ও গোষ্ঠবাবু ইন্সপেক্টর হন্তদন্ত হয়ে স্টেশনের ভিতর বার করছেন। ক্ষুদিরামদা উত্তেজিত। জনতা উত্তেজিত। এমন সময় প্ল্যাটফর্মে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ জন সশস্ত্র সৈন্য এসে গেল। শোনা গেল গাড়োয়ালি সৈন্য। গোষ্ঠবাবু হুকুম দিলেন জনতা বেআইনি। পাঁচমিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হতে হবে না হলে গুলি চলবে। জনতা সরল না, মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি। স্বেচ্ছাসেবক অধিনায়ক সারি দিয়ে প্ল্যাটফর্মে স্বেচ্ছাসেবক মোয়াতেন করলেন। আমরা সময় গুণতে লাগলাম কখন গুলি চলে। গাড়োয়ালি সৈন্য রাইফেল হাতে অবস্থান নিয়ে নিলে। পাঁচমিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠবাবু গুলি চালাবার হুকুম দিলেন 'ফায়ার।' কি আশ্চর্য গাড়োয়ালি সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ ঘাড় থেকে রাইফেল নামিয়ে মাটিতে রেখে দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকল। গোষ্ঠবাবু হাবিলদারকে কি বললেন ও পরে ছুটে গিয়ে স্টেশনের ঘর থেকে পুলিশ সাহেবকে ডেকে আনলেন। ইংরেজ পুলিশ সাহেব বেরিয়ে এসে হুকুম দিলেন 'ফায়ার।' সৈন্যবাহিনী চুপচাপ। হাবিলদার বললেন, 'ও লোক গোলী নেহি চালাতে হ্যায়— হাম কেয়া করে।' সাহেব মুখ লাল করে ফিরে গেলেন। নেতাদের প্রথম শ্রেণিতে নিয়ে যাওয়া হবে ঘোষণা হল— জনতা গাড়ির অবরোধ ছেড়ে দিলেন। জনতার জয় হল। পরে ওই বাহিনীর অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয় বলে শোনা গিয়েছিল।

পুলিশ বিদ্রোহ

১৯৩০ সালের আন্দোলনের চরম অবস্থায় ইংরেজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট কাটোয়া আসার আগের দিন তাঁকে বয়কট করে ও পরের দিন শহরে হরতাল ঘোষণা করে ঢেঁড়া দেওয়া হল। ঢেঁড়া দিতে

গিয়ে এককড়ি দত্ত, মহিম ঘটক এবং আমরা অনেকে গ্রেপ্তার হলাম। পরের দিন কোর্ট হাজতে থাকার সময় শুনলাম শহরে পূর্ণ হরতাল হয়েছে। কিন্তু একটা গোরুর গাড়ি গঙ্গার ধারে গার্লস্ স্কুল থেকে চেয়ার বেঞ্চি নিয়ে আসছিল 'টাউনহলে' ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অভ্যর্থনা সভার জন্য। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক রাস্তায় গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ছেন খবর পেয়ে গোষ্ঠবাবু পুলিশ নিয়ে গিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিতে। একজন পুলিশ বিদ্রোহ করে মাথার লাল পাগড়ি ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, 'নকড়ি নেই করেগা'। সে গ্রেপ্তার হয়।

আদালতের হালচাল

সে সময়ে কাটোয়াতে মহকুমা শাসক ছিলেন আর, এল, দে। শোনা যায় তিনি নাকি ভাগ্যকুলের রায়েদের বাড়ির জামাতা ছিলেন। খুব জবরদস্ত অফিসার। তাই ১৯৩০ সালের আন্দোলনে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কাটোয়াকে ঠান্ডা করার জন্য তাঁকে এখানে পাঠানো হয়। তিনি স্বদেশী মামলা ধরতেন সন্ধ্যার পর— হ্যারিকেন জেলে রাত দশটা পর্যন্ত কাছারি করতেন। একদিন রাত্রে আদালতে হাজির করার পর যখন কোর্ট হাজত থেকে জেলখানা নিয়ে যাওয়া হয় তখন স্বদেশী আন্দোলনের বন্দিদের চোর ডাকাতদের সঙ্গে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে এককড়িদা ও মহিমদার প্রতিবাদে কোর্ট হাজতের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়। খবর পেয়ে কোর্ট থেকে মহকুমা শাসক এসে তর্কাতর্কির পর আমাদের দাবি মেনে নেন। হাতকড়া ও দড়ি আর লাগানো হল না।

- ❑ শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *সাপ্তাহিক কাটোয়া* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১৯ আগস্ট, ২৫ আগস্ট, ২ সেপ্টেম্বর, ১৬ সেপ্টেম্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২) প্রকাশিত।

কাটোয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের গোড়ার কথা

শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়

কাটোয়া মহকুমায় কৃষক আন্দোলনের প্রকৃত শুরু বর্তমান শতকের চল্লিশের দশকে। যদিও ১৯৩৩ সনের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বর্ধমান জেলার সদর থানার হাটগোবিন্দপুরে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে এবং গুসকরার মুক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন এবং পরে শ্রী চট্টোপাধ্যায় এর সহযোগিতায় গুসকরার পাশে আলুটগ্রামে দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে কাটোয়া মহকুমায় প্রথম কৃষক সভা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যে দুজনের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ক্ষীরগ্রামের দাশরথি চৌধুরী এবং করজগ্রামের অশ্বিনী মণ্ডল। এঁরা উভয়েই ১৯৩০-৩১ সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরে দাশরথি চৌধুরী বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির অন্যতম নেতা হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহকর্মী হিসেবে কৃষক আন্দোলনের পদ্ধতি ও কর্মসূচির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত দাশরথি চৌধুরী ও অশ্বিনী মণ্ডলকে কেন্দ্র করেই কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামগুলিতে কৃষক সংগঠনের কাজ চলতে থাকে। ক্ষীরগ্রাম ও করজগ্রাম ছাড়াও সমসাময়িককালে কাটোয়া মহকুমার অন্যান্য যে সমস্ত গ্রামে ধীরে ধীরে শক্তিশালী কৃষকসভা গড়ে ওঠে সেগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হল শ্রীখণ্ড, কৈচর, কুরচি, অগ্রদ্বীপ, কালিকাপুর, সুদপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল। আর যাঁদের প্রচেষ্টায় এই কাজ সম্ভবপর হয়েছিল তাঁরা হলেন সর্বশ্রী নদীয়ানন্দ ঠাকুর, অনঙ্গ রুদ্র, ললিত হাজরা, শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায়, সুনীল পাল, সুশীল চক্রবর্তী এবং এককালের কংগ্রেসকর্মী জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ।

কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলি বলতে গেলে জন্মলগ্ন থেকেই ছিল কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত। প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের অনেকেই এককালের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসকর্মী হলেও কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন শুরু করার বহু পর্ব থেকেই এঁরা প্রায় সকলে ছিলেন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মী এবং আন্দোলন পরিচালনায় অভিজ্ঞ। ক্ষীরগ্রামের দাশরথি চৌধুরী প্রকৃতই একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন, সে সময় বিভিন্ন সংগঠনগুলির সঙ্গে তিনিই যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কৃষক সংগঠন ছাড়াও শ্রমিক সংগঠনেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তখন কাটোয়া মহকুমায় শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা বলতে বর্ধমান-কাটোয়া আহমদপুর ছোটো লাইনের রেল শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে বোঝাত। এই সমস্ত অঞ্চলের শ্রমিকদের নিয়ে দাশরথিবাবুর সভাপতিত্বে এ কে বি কে রেলওয়ে ওয়াকার্স ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৯৪৪ সালে কাটোয়ার পাতালগড়ের নিকট একটি বাড়িতে কাটোয়া কমিউনিস্ট পার্টির শাখা অফিস খোলা হলে ওই একই বাড়িতে কৃষক সমিতি ও এ কে বি কে রেলওয়ে ওয়ার্কাস ইউনিয়নের অফিসও খোলা হয়। ফলে নবোদ্যমে শ্রমিক কৃষক সংগঠনের কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে শুরু হয়ে যায়।

পার্টির প্রথম স্থানীয় সম্পাদক শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষক নেতা ও এ, কে বি কে রেলওয়ে ইউনিয়নের সভাপতি দাশরথিবাবু দুইজনেই অফিস কমিউনের সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। গ্রাম ও শহরের কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা মিলিত হয়ে এখানেই তাঁদের নিজ নিজ এলাকার আন্দোলনের কর্মসূচি এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

এরপর কাটোয়া মহকুমায় কৃষক সমিতি গড়ার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের বছরে। এইসময় অগ্রদ্বীপের সন্তান চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম বিপ্লবী নেতা সুবোধ চৌধুরী জেল থেকে মুক্ত হয়ে কয়েকদিনের জন্য গ্রামে আসেন। সুবোধ চৌধুরী জেল থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত পার্টি) সদস্যপদ লাভ করেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল অগ্রদ্বীপে মায়ের কাছে কিছুদিন কাটিয়ে জেলার আসানসোল অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা। গ্রামে এসে কৃষকদের উপর জমিদারদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা দেখে তিনি বিচলিত হন এবং অচিরেই জমিদারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলন শুরু করেন। কৃষকদের যথেচ্ছ ফসল খাওয়ানো, জমির স্বত্ব না দেওয়া, বেগার খাটানো ইত্যাদির বিরুদ্ধে সুবোধ চৌধুরী স্লোগান দিলেন— 'ফসল খাওয়ানো বন্ধ'। ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে একদিন কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে সারারাত জেগে জমিদারের গোরু ধরল এবং গোরু সমেত তাদের ফসলের ক্ষতিপূরণ দাবি করল। অগ্রদ্বীপের জমিদার মল্লিকবাবুরা লেঠেলদের সাহায্যে তাদের শাসিয়ে তাড়িয়ে দিলে বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন কাটোয়া মহকুমা শাসকের আদালতে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে মিছিল করে আসে। কৃষকদের সেই মিছিলই কাটোয়া মহকুমায় প্রথম সংগঠিত কৃষক মিছিল।

এরপরেই সুবোধ চৌধুরী অগ্রদ্বীপ গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার জন্য উদ্যোগী হন। সেইসময় পশ্চিম দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের কারণে বিতাড়িত হয়ে এসে সৌরী ঘটক এই বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করেন এবং শিক্ষকতার দায়িত্ব তুলে নেন। এই বিদ্যালয়টি বিপুল বাধা সত্ত্বেও তৎকালীন বর্ধমান জেলা স্কুল বোর্ডের সহসভাপতি বিশিষ্ট প্রগতিশীল কংগ্রেস নেতা আবুল হায়াৎ সাহেবের চেষ্টায় অনুমোদন লাভ করে। এইভাবে অগ্রদ্বীপ গ্রামে নির্যাতিত কৃষকদের সংগঠিত করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে সুবোধ চৌধুরী জমিদার বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। পরে যত দিন যেতে লাগল সুবোধবাবু ততই গ্রামের বিভিন্নরকম সমস্যা ও উন্নয়নমূলক কাজে আরও জড়িয়ে পড়লেন। ফলে আর তাঁর আসানসোল যাওয়া হয়ে উঠল না।

গ্রামাঞ্চলে ইতিপূর্বেই দাশরথি চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং শ্রীখণ্ডের নদীয়ানন্দ ঠাকুরের উদ্যোগে কৃষক সমিতি গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। অনঙ্গ রুদ্রও তখন কৈচরে কৃষকদের মধ্যে কাজ করছেন। শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়ও ১৯৪৪ সালে কাটোয়ার সবুজ সংঘের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাশরথি চৌধুরীর আনুকূল্যে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরে তাঁরই নেতৃত্বে কাটোয়ায় গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান ইউনিয়ন, দর্জি ইউনিয়ন শুরু হয়। সেইসঙ্গে রেল শ্রমিক আন্দোলনও। সুবোধবাবু বরাবরই পার্টির সঙ্গে যোগ রেখেই অগ্রদ্বীপে কাজ করতেন এবং মূলত তাঁরই নেতৃত্বে অগ্রদ্বীপে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। এই কাজে কাটোয়া পার্টির নেতৃত্বে ম্যাকলিয়ড কোম্পানি পরিচালিত আহমেদপুর কাটোয়া ও বর্ধমান কাটোয়া ন্যারোগেজ রেলের শ্রমিক

ট্রেডইউনিয়নের শ্রমিক কমরেডরা ছুটি নিয়ে অগ্রদ্বীপ গ্রামে যেতেন এবং স্কোয়াড পথসভা প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষকদের সমিতি গড়ে তোলার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। অগ্রদ্বীপের কৃষক সমিতি গঠনে এ-কে বি-কে রেলওয়ে শ্রমিকদের অবদান স্মরণীয়। ১৯৪৬ সালে এ-কে বি-কে রেলের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের ফলে কৃষক সমিতি আরও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। সুবোধ চৌধুরী ও রেলওয়ে শ্রমিক কমরেডদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই অগ্রদ্বীপে প্রথম কৃষক সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৬ সালে মহকুমার মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে কাটোয়ায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শ্রীখণ্ডে একটি কৃষকসভায় ড. ভূপেন দত্ত এবং তৎকালীন প্রগতিশীল কংগ্রেস নেতা আবুল হায়াৎ বক্তৃতা করেন। এই সভা দাশরথি চৌধুরী ও অমলেন্দু রায়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবাড়ির একাংশ এতে বাধা দিলেও সভার কাজ সুষ্ঠুভাবেই সফল হয়। শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়ও এই প্রথম কৃষকসভার কাজে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে দাঙ্গা প্রতিরোধে শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, দিবাকর দত্ত, সনৎ দত্ত, শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। জেলার বিশিষ্ট কৃষক নেতা সৈয়দ শাহেদুল্লাহ সাহেব, শিবশংকর চৌধুরী এবং দাশরথি চৌধুরী এই কাজে বিশেষ সাহায্য করেন। এইভাবে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে সভাসমিতির মাধ্যমে কৃষকরা রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে সংগঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারদের বিরুদ্ধে ছোটোখাটো আন্দোলন ক্রমশ সংঘর্ষের রূপ নিতে থাকে। বিশেষ করে অগ্রদ্বীপের কৃষকদের জমিদার বিরোধী আন্দোলনে ভীত জমিদাররা গুণ্ডা দিয়ে কৃষককর্মী মহাদেব বিশ্বাসকে খুন করার চেষ্টা করে। অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য কাটোয়ায় আনা হয়। ক্ষুব্ধ কৃষকরা মিছিল করে কাটোয়া মহকুমা শাসকের কোর্টে এসে বিচারপ্রার্থী হয়। অগ্রদ্বীপের জমিদারদেরই একজন তখন কাটোয়ার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। স্বভাবতই প্রশাসন ও পুলিশের উপর তাঁর যথেষ্টই প্রভাব ছিল। স্বাভাবিক কারণেই প্রশাসনের খুব একটা সাহায্য এই ঘটনায় মেলে না। প্রখ্যাত সাম্যবাদী সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় এক সাহিত্য সম্মেলনে কাটোয়া এসেছিলেন। তিনি হাসপাতালে আহত মহাদেব বিশ্বাসকে শুধু দেখতেই যাননি— তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'এতদিন ওরা মেরেছে এবার আমাদের মার দেবার পালা'।

এই অবস্থার মধ্যে ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে পার্টি তথা কৃষক নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। নেতাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরুতেই সুবোধবাবু ও আরও কয়েকজন আত্মগোপন করেন। কিন্তু সৌরী ঘটক, সুশীল চক্রবর্তী, অনঙ্গ রুদ্র গ্রেপ্তার হন। এইসময় দুর্গাপূজার নবমীর দিন বিকেলে অগ্রদ্বীপে এক বিরাট কৃষক জমায়েতে আত্মগোপনকারী সুবোধ চৌধুরী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ আত্মপ্রকাশ করে বক্তৃতা দেন। সভায় সংঘর্ষ বাধে। সুনীল পাল নামে একজন কিশোর ক্যাম্প পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে শহিদ হন। পুলিশের দুটি রাইফেল কৃষকেরা ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্রদ্বীপে ব্যাপক পুলিশি নির্যাতন শুরু হয়। গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রাইফেলের খোঁজে পুলিশ সংগ্রামী কৃষকদের পাড়া গোপীনাথপাড়া লাঙল দিয়ে চষে ফেলে। শুরু হয় ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অকথ্য

নির্যাতন। নির্যাতিত অন্যতম সংগ্রামী নেতা কমরেড মণি কর্মকারের জেলে মৃত্যু ঘটে। সেইসঙ্গে জেলে গুলি চালনায় কমরেড সুশীল চক্রবর্তীরও জীবনাবসান হয়। এইসময় যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে তা হল কৃষক আন্দোলনের বিস্তার। অগ্রদ্বীপের গ্রামছাড়া কৃষকেরা সংলগ্ন নদীয়া জেলা ও কাটোয়া মহকুমার অন্যান্য গ্রামে আশ্রয়লাভের আশায় গিয়ে সেখানেও কৃষক সমিতি গড়ে তোলেন। তাই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫২) যখন কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে, কাটোয়া কেন্দ্রের প্রার্থী সুবোধ চৌধুরী ওয়ারেন্ট থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। তখন কৃষক আন্দোলন মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গেছে। অগ্রদ্বীপের কৃষকদের নেতৃত্বে শুধু সেই গ্রামের জমিদারদের নির্যাতনের বিরুদ্ধেই নয়, দাঁইহাটের তোলা বন্ধের বিরুদ্ধেও সংঘবদ্ধ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। কাটোয়া মহকুমার কৃষক আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাস হল মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের সমবেত ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাস।

❑ *সাপ্তাহিক কাটোয়া* পত্রিকায় (শারদ সংকলন ১৩৯৮) প্রকাশিত